দৈনিক জনকণ্ঠ
7 JUL 2008
পৃষ্ঠা - ৭ - কলাম -

উচ্চ মাধ্যমিকের পর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি প্রক্রিয়া কী হবে?

পাবলিক পরীক্ষার ওপর আস্থাবোধ অনেকটাই পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে এবং ভর্তিভিত্তিক বহুবিধ বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির জন্য সরাসরি পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ডিগ্রি কলেজ গুলোতে ভর্তি করা যায়।...পাবলিক পরীক্ষার ভিত্তিতে যখন শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষাঙ্গনে আসবে, সেখানেও নকলের প্রশ্নে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে এবং পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার করতে হবে। উচ্চশিক্ষাঙ্গনে সরাসরি ফলাফল ভিত্তিক ভর্তির ব্যাপারে ইউজিসিই প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে পারে। আমার ধারণা, তারা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেও। সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় গুলো বেঁকে বসলেও শেষটা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। এই ভূমিকাও হবে সাহসী। আমরা ইউজিসির কাছ থেকে এমনিতর একটি পদক্ষেপ এ বছরের ভর্তি মৌসুম থেকে আশা করছি

অধ্যাপক ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী

সদ্য প্রকাশিত মাধ্যমিক শিক্ষার ফলাফল বিপর্যয়কর নয়, আকাঙ্ক্ষিত ছিল। এবার বিদ্যুতের উৎপাত বাদ দিলে ছাত্রছাত্রী অন্তত নিরুবিঘ্ন পরিবেশে পড়াশোনা ও পরীক্ষা দিতে সমর্থ হয়েছিল। সকল মহলের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার মাত্রাও বেড়েছে। সুচিন্তিত পুরস্কার তিরস্কার সুফল যে দিতে পারে তাও এক বছরে প্রমাণিত হলো। একমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড ছাড়া অন্যত্র নকলের মাত্রাও ব্যাপক হারে কমেছে। এই কমে যাওয়াটি একটি শুভ সংবাদ। আমরা বলে থাকি, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। নকল প্রবণতা এই মেরুদণ্ডটা ক্রমশ দুর্বল করে সর্বশেষ একটি নকল সমাজ ও মানুষ উপহার দিতে পারে। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, সারাদেশ ও জাতি এই অভিশাপ থেকে ক্রমশ মুক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এই নকল প্রবণতার কারণেই মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে নয়, ভাল কলেজগুলোতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ভিত্তিতে উচ্চ-মাধ্যমিকে ভর্তি করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক দুটো পরীক্ষার ব্যাপারে অনাস্থা প্রকাশ করে অনার্স ক্লাসে ভর্তির ব্যাপারে লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষার প্রচলন করেছে। বিবিধ কারণে এসব এখন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পর্যায়ে। এই প্রেক্ষিতে শুধুমাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষার ভিত্তিতে কলেজে ভর্তির বিষয়টি একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে ভর্তিকেন্দ্রিক বিড়ম্বনার সামগ্রিক অবসান না হলেও আংশিক সুরাহা যে হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই ভর্তি ও ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির ভাগীদার অনেকে এবং সে কারণে এমনি একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্ম হয়েছে, যাদের ডিঙ্গিয়ে সরাসরি পাবলিক পরীক্ষার ভিত্তিতে পরবর্তী শিক্ষাস্তরে প্রবেশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কায়েমী স্বার্থভোগীর মধ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ অন্যতম। পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হবার তীব্র প্রতিযোগিতা ও তার পেছনে কাড়ি কাড়ি টাকা ব্যয়ের মহাযজ্ঞ দেখলেই বোঝা যায়, কেন তার তীব্র আকর্ষণ। এ নিয়ে কারও পৌষমাস, কারও সর্বনাশ। ভর্তি বাণিজ্য কতটা আকর্ষণীয় হতে পারে তারও প্রমাণ পাওয়া যায় কোচিং সেন্টারগুলোর রমরমা ব্যবসায়। এখানেও প্রমাণ আছে যে, শিক্ষা এক ধরনের পণ্য এবং শুধুমাত্র বিত্তশালীরাই সে পণ্য স্বাচ্ছন্দ্যে ক্রয় করতে পারে। এই কথাটিও আংশিক সত্য। এখন কোচিং সেন্টারের প্রতি ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে একটা দুর্বার আকর্ষণ। কোন অভিভাবক কিংবা পিতা-মাতা এই আকর্ষণ এড়াতে পারেন না বলে ধারকর্য করেও ছেলে বা মেয়ের কোচিংয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন। কোন পিতা-মাতা এ ব্যাপারে অপারগ হলে এবং সন্তানটি উচ্চ-শিক্ষালয়ে ভর্তি না হতে পারলে এই বিষয়টি চিরকালীন ঝগড়ার বিষয়ে পরিণত হয়। বিলাতে প্রতি বছর 'হলিডে'তে যাওয়া এক ধরনের মর্যাদার বিষয়। যে পরিবারের সন্তান 'হলিডে'তে যেতে পারে না তারা বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের মুখ দেখাতে সঙ্কোচ করে। আমাদের দেশে শিক্ষার্থীরা তেমনি কোচিং সেন্টারে যেতে না পারলে নিজেদের সমাজ পরিত্যক্ত ভাবতে শিখে এবং নিজেদের যে কোন ব্যর্থতার দায়ভার অভিভাবকের উপর চাপিয়ে দেয়। তাই নিরুপায় অভিভাবকরা উপায় খুঁজে বের করে। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি হতে কত টাকা প্রয়োজন হয় তার সঠিক হিসাব আমার জানা নেই। তবে একজন সাধারণ শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টায় অন্তত যে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা লেগে যেতে পারে— এই কথাটা বিবেচনায় রাখলে কোচিং এক ধরনের বিকাশমান শিল্প। একথা বললে ভুল হবে না যে, আজকের মতো প্রাতিষ্ঠানিক বা বহুজাতিক কোম্পানির আদলে কোচিং সেন্টার গড়ে না উঠলেও অতীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কোচিং ছিল। স্কুলের শিক্ষকরাই স্বল্প ফী-তে অন্তত দু'তিন মাস ছাত্রদের কোচিংয়ের ব্যবস্থা করত। তবে সেকালে এটাকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি বলে কোচিংয়ের এত সব দুর্নাম ছিল না।

এ কথা সত্য যে, মাধ্যমিক শিক্ষাঙ্গনে দুর্বল শিক্ষার কারণেই কোচিং সেন্টার বিকশিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অপ্রতিরোধ্য নকল প্রবণতার কারণে ঐ সব পরীক্ষার ফলাফলে এক ধরনের অনাস্থা ও অনীহার জন্ম হয়েছে। যার প্রেক্ষাপটে ভর্তির লিখিত পরীক্ষা ও তার সাথে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য অনাস্থার ছাপটি ছিল শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত ৫০ ভাগ নম্বরের সাথে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ৫০ ভাগ নম্বর যোগ করে চূড়ান্ত পর্যায়ে শিক্ষার্থী নির্বাচন করত। এর পরও মৌখিক পরীক্ষা পরিচালনা করা হতো। মৌখিক পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগে কোথাও কোথাও মৌখিক পরীক্ষা তুলে দেয়া হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও মৌখিক পরীক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর নামমাত্র পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। অবশ্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবির্ভাবের কারণে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ কমেছে। তবে বিতর্কিত মূল্যায়নের ভিত্তিতে কিছু কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিড়-বাট্টা বাড়ছে এবং সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে সেগুলোতে ভর্তির জন্য কোচিং সেন্টারের সহায়তা নেয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে কোচিং এখন বিশাল শিল্প এবং তার সুবিধাভোগী অনেকেই। এই প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তির বিষয়টিও সংস্কার একান্ত প্রয়োজন।

গত বছর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভর্তির ব্যাপারে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলকে ভিত্তি ধরতে চেষ্টা করেছিল। ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম কিছু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তা কার্যকর করতে এগিয়ে এসেছিলেন। অবশ্য সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আমার ধারণা, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অর্থাৎ নকলের মহোৎসব অবদমনের প্রেক্ষাপটে সরাসরি এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সম্ভব। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করছি, ব্যক্তিগতভাবে বহু বছর যাবত আমি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থেকে দেখেছি যে, ভর্তির ব্যাপারে কোচিং তেমন কোন ভূমিকা রাখে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লক্ষ্য করেছি যে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের সাথে ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলের একটি ধনাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী কিংবা গ্রেড পয়েন্ট পাঁচ প্রাপ্তরা ছাড়া অন্যরা কদাচিৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে। বুয়েট হয়ত এই বিষয়টি অনুধাবন করে তাদের ভর্তিচ্ছু ছাত্রদের প্রথম এক হাজার জনের পরীক্ষা নিয়ে থাকে। অন্যরা ফী দিয়েও ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পারে না। এটা খারাপ ব্যবস্থা নয়, তবে মন্দের ভাল। আমার ধারণা পাবলিক পরীক্ষার ওপর আস্থাবোধ অনেকটাই পুনর্প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনায় রেখে এবং ভর্তিভিত্তিক বহুবিধ বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির জন্য সরাসরি পাবলিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা ডিগ্রি কলেজ গুলোতে ভর্তি করা যায়। এক্ষেত্রে মেধা তালিকা প্রস্তুত হয়ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কেউ কেউ হয়ত মৌখিক পরীক্ষা প্রবর্তনের কথা ভাবতে পারে। এই ধারণাটা যদি নেহাতই কার্যকর করতে হয় তাহলে মৌখিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ ৫ নম্বর রাখতে হবে এবং কাউকে সর্বনিম্ন এক ও সর্বোচ্চ ৪ নম্বর পর্যন্ত নম্বর দেয়া যাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্যকালীন এম বি এ ভর্তি পরীক্ষায় এ ব্যবস্থাটি প্রবর্তিত আছে। আমার মতে, মৌখিক পরীক্ষা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ এই ব্যবস্থায় তদ্বির ও স্বজনপ্রীতির জন্ম দিতে পারে। আমার ধারণা গ্রেডিং সিস্টেম প্রবর্তনের পরও মেধা তালিকা প্রস্তুত কঠিন ব্যাপার নয়। তা সময়সাপেক্ষ হতে পারে। সে জন্যে যে মানবসম্পদ প্রয়োজন হবে তাদের পুরস্কৃত করার জন্য একটা ফী বেঁধে দেয়া যায়। তাতেও অভিভাবকদের অনেকটা স্বস্তি ফিরে আসবে, সন্তান-সন্ততিদের গঞ্জনা-লাঞ্ছনা শিথিল হবে। পাবলিক পরীক্ষার ভিত্তিতে যখন শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষাঙ্গনে আসবে, সেখানেও নকলের প্রশ্নে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে এবং পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার করতে হবে। উচ্চশিক্ষাঙ্গনে সরাসরি ফলাফল ভিত্তিক ভর্তির ব্যাপারে ইউজিসিই প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে পারে। আমার ধারণা, তারা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেও। সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় গুলো বেঁকে বসলেও শেষটা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। এই ভূমিকাও হবে সাহসী। আমরা ইউজিসির কাছ থেকে এমনিতর একটি পদক্ষেপ এ বছরের ভর্তি মৌসুম থেকে আশা করছি।

amchoudhury@yahoo.com
লেখক: শিক্ষাবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা